বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা ১২ই জুলাই ১৯৭৫ শনিবার ২৭শে আষাঢ় ১৩৮২ মূল্য—২৫ প.

আমাদের এখন দরকার উত্তম ব্যবহারিক বুদ্ধি, জাতীয় কল্যাণ সাধনের চেতনা এবং এমন ধর্ম ও দর্শন যা আমাদের প্রকৃত মানুষ করে তুলবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সম্পাদকীয়

জরুরী অবস্থা ঘোষনার পরে

ভারতীয় রাজনীতির অত্যুগ্র উত্তাল অবস্থাটা আপাততঃ খানিকটা প্রশমিত হইয়াছে অর্থাৎ, থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্কট কাটিয়া গিয়াছে। বেহুশ দ্রুতগামী মোটর গাড়ী বেপরোয়া ভাবে চলিতে চলিতে সামনের একটা বেরিকেডে বাধা পাইয়া থামিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে সঙ্কট শেষ হয়না। অসাবধান পথচারীগণ কিছুক্ষণের জন্য স্বস্তি অনুভব করিবার অবকাশ পাইতে পারে মাত্র। নানা-শ্রেণীর যান বাহন এবং পদযাত্রীদের নিত্য ব্যবহার্য্য রাজপথের মধ্যে, অস্বাভাবিক একটা বেরিকেড যেমন চিরস্থায়ী হইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না তেমনি আবার সাধারণের ব্যবহার্য্য রাজপথকে কখন কখন বিশেষ নিয়ন্ত্রণে রাখিবার প্রয়োজনও হইতে পারে।

অবস্থা ভেদে ব্যবস্থার তারতম্য সর্ব্ব সর্ব্বক্ষেত্রেই হইয়া থাকে এবং হওয়াই বাঞ্ছনীয়। জন-জীবনের ছোট খাট ঘটনা বা উপদ্রব অনিতাচারকে শাসনে আনিবার জন্য সাময়িক ভাবে ১৪৪ ধারা অথবা কার্ফু আইন বলবৎ করিলেই হয়তো চলিতে পারে,—আরও কিছু বেশী বাড়াবাড়ি কোথাও যদি দেখা যায় তবে, সাময়িক ভাবে সীমিত পরিধির মধ্যে জঙ্গী আইন বলবৎ করিয়াও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু, যে বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে শাসনে আনিবার জন্য সম্প্রতি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইয়াছে তাহাকে কোন ছোট খাট বা মামুলি ধরণের উপদ্রব বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারেনা কোন ক্রমেই। কয়েকটি প্রভাব প্রতিপত্তিহীন অত্যন্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ রাজনৈতিক দল, বৎসরাধিক কাল ধরিয়া গণতান্ত্রিক বিধি বিধান সম্মত উপায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তিকে শুধুই যে লোক চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিল তাহাই নয় বস্তুত, রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতাকে পঙ্গু করিয়া দিবার জন্য, গণতন্ত্রের নামে, নানাধরণের অগণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছিল। এই সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলির মধ্যে কেহই যে একক ভাবে, এই দেশে একটা সবল বিকল্প শক্তির বা নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করিতে সক্ষম নয় সে কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। তাহারা যে কোন শক্তিশালী যৌথ নেতৃত্ব গঠন করিয়া একটি মাত্র অঙ্গরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিতেও অক্ষম তাহার শেষতম প্রমাণ হইতেছে গুজরাট বিধান সভার সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনের ফলাফল। নিজেদের এই অক্ষমতা এবং অযোগ্যতার কথা জানিয়া শুনিয়াই, এই সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলি একটিমাত্র অশুভ সূত্রে ঐক্যবদ্ধ হইয়া দেশব্যাপী একটা অরাজকতা মূলক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট

হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের তথাকথিত ঐক্যের সেই অশুভ সূত্রটি ছিল এই যে, ছলে বলে কৌশলে সর্ববিধ উপায়ে গণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অনাস্থা সৃষ্টি করিয়া প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তির সবলতা ও স্থায়িত্বকে বিনষ্ট করা এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির বর্তমান ধারক বাহক বলিতে সারাদেশে যে একটিমাত্র সবল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অস্তিত্ব আছে তাহাকে ধ্বংস করা। ইহাকেই বলা হইয়াছে বিপ্লব। সিংহই হউক অথবা সাপই হউক, ছোবল মারিবার কিম্বা তীক্ষ্ণ নখের থাবা মারিবার শক্তি যাহাদের থাকে, আকস্মিক আক্রমণে তাহাদেরও যদি কোমর ভাঙ্গিয়া যায় এবং মাথা গুড়া হইয়া যায় তথাপি শেষ নিশ্বাস ফেলিবার পূর্বে, পুচ্ছ আন্দোলনের দ্বারা প্রতিবাদ জানাইতে সকলেই চেষ্টা করে। গণতান্ত্রিক শাসন স্বভাবতঃই সহিষ্ণু এবং ডিক্টেটর পন্থী শাসন শক্তির তুলনায় বহুলাংশে শিথিল ও মন্থরগতি। গণতন্ত্রের সেই স্বভাব সহিষ্ণুতা শিথিলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া কয়েকটি দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল, বৎসরাধিক কাল ধরিয়া, যে ভাবে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক স্বাধীনতার ও রাষ্ট্রনীতির সমালোচনার অধিকারের অপব্যবহার করিয়া আসিতেছিল তাহাতে মনে হয় যেন এই বিরোধী দলগুলি ভুলিয়া গিয়াছিল যে, সহিষ্ণুতাকে দুর্বলতা মনে করা চলেনা, শিথিলতাকে অক্ষমতা বলিয়া ভুল করাও নিতান্ত মূর্খতা। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অপ-ব্যবহার যে সেই স্বা ধী ন তা র মূলে কুঠারাঘাত করিয়া থাকে এবং পরিণামে স্বাধীনতার সঙ্কোচন অবশ্যম্ভাবি হইয়া ওঠে তাহা জানিয়া শুনিয়াও যাহারা সেই পরিণাম ডাকিয়া আনে তাহারা যে অবশ্যই কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে এবং কোন অশুভ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ধরণের কার্যে ব্রতী হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অতএব, গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী সুস্থ চিন্তাশীল কোন লোকই বলিতেছেনা যে সম্প্রতি দেশে যে জরুরী অবস্থা কার্যকর করা হইয়াছে তাহার কোন প্রয়োজন ছিলনা কিম্বা এই ব্যবস্থার প্রয়োগ আর একটি দিনও বিলম্বিত হওয়া উচিত ছিল বা সম্ভব ছিল।

তথাপি ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে "জরুরী অবস্থা" স্বাভাবিক অবস্থা নয় সুতরাং চিরস্থায়ী হইতে পারেনা, দীর্ঘস্থায়ী হইতে দেওয়াও সঙ্গত নয়। জরুরী অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ি হইতে দেওয়া যেরূপ অবাঞ্ছনীয়, বারংবার জরুরী শাসন ব্যবস্থা প্রয়োগের প্রয়োজন হওয়াও যে ততোধিক অবাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কেও দ্বিমত থাকিতে পারেনা। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রমাণিত হয়। এই কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াই সম্ভবতঃ প্রধান মন্ত্রী জনগণকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন যে সদ্য ঘোষিত জরুরী শাসন ক্ষমতাকে যতদূর সম্ভব স্বল্পকাল ব্যবহার করাই তাঁহার সরকারের আন্তরিক অভিপ্রায়। ব্যাপকভাবে প্রয়োগের ইচ্ছাও তাঁহার নাই।

আমরা সরকারের আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করিনা কারণ, জরুরী শাসন ব্যবস্থা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই যে কয়টি উদ্বেগ জনক পরিস্থিতিকে শাসনে আনিবার জন্য, সরকার এবং প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং, মনোনিবেশ করিয়াছেন তাহা যে সরকারী শুভ বুদ্ধির প্রকৃষ্ট প্রমাণ, সেকথা, সুস্থ ভাবে চিন্তা করিয়া,

কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেনা। প্রথমতঃ, নিত্য ব্যবহার্য্য এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যমানের ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্যবাদী অস্থিরতা দীর্ঘকাল যাবৎ জনজীবনকে নিষ্পীড়িত করিয়া চলিতেছিল। ব্যবসায়ী শ্রেণীকে শুধুই পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় নাই, নানা ধরনের তোষণ নীতির দ্বারা তাহাদের স্বতস্ফূর্ত্ত সহযোগীতা অর্জ্জনের চেষ্টাও কম করা হয় নাই। তথাপি কোন ক্রমেই অবস্থাটা যুক্তি সম্মত ভাবে আয়ত্তের মধ্যে আসিতেছিল না। ব্যবসায়ীরা, তাহাদের পক্ষে, সরকারী নীতির সুযোগ সুবিধা গুলিই মাত্র গ্রহণ করিয়া মুনাফা অর্জ্জন করিতেছিল, কিন্তু মূল্যমানের স্থিরতা সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাহারা সরকার বিরোধী ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছিল। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শিল্পপতিদের যত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইতেছিল তাহার কোনটাই তেমন কার্য্যকর হইতেছিল না। জরুরী শাসন ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, সরকার, এই দুইটি শ্রেণীকে শাসনে আনিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু প্রাসঙ্গিক সরকারী নীতি ও বিধি বিধান গুলিকে সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য যাহাদের প্রশ্নহীন এবং দ্বিধাহীন আনুগত্য প্রয়োজন, যাহাদের নিয়মানুগ সক্রিয় সহযোগীতা ভিন্ন সরকারী কোন নীতিই সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে না, যাহাদিগকে সরকারী যন্ত্রের চক্ষু কর্ণ ও হস্ত-পদাদির মতই প্রয়োজনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা যায় সেই স্থানে একটা প্রচণ্ড ফাটল সৃষ্টি হইয়া আছে অতি দীর্ঘকাল যাবৎ। বস্তুত সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটি বিরাট অংশের দায়িত্ব সচেতন সহযোগীতা হইতে, সরকার বঞ্চিত—শুধু বঞ্চিতই নয়, ইহাদের অসহযোগীতার ভূমিকাই অতি মাত্রায় সুস্পষ্ট ও সোচ্চার। ইহারা কাজ করেনা, নিয়মানুবর্ত্তীতার বিধি ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করে, নানা অজুহাত ও অছিলায় সরকারী কাজের গতি ব্যহত করিয়া, সরকারের উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি মানুষের অনাস্থা সৃষ্টি করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বা লজ্জাবোধ করেনা। সরকারী নীতি সম্পর্কিত যে সকল অন্তর্ঘাত মূলক গুজব প্রচারিত হইয়া থাকে তাহাদের একটা বৃহৎ অংশ, মূলতঃ, একশ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীর কল্পনা হইতেই জন্মলাভ করে এবং তাহাদের মাধ্যমেই জনতার হাটে আসিয়া পৌঁছায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে "আর্যাভট্ট" সম্পর্কিত গুজবের কথা উল্লেখ করা যায় এবং, একশত টাকা মূল্যের নোট, জরুরী বিধান বলে, সরকারী আদেশে বাতেয়াপ্ত হইয়া যাইবে বলিয়া সম্প্রতি যে গুজব প্রচারিত হইয়াছিল তাহার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেকেই আমাদের বলিয়াছেন যে, কোন কোন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের কোন না কোন শাখা আপিস হইতে একশত টাকার নোট বাতেয়াপ্ত হইবার সম্ভাবনার কথা তাঁহারা শুনিয়া আসিয়াছেন। ফলতঃ, কলিকাতার কোন কোন বাজারে, শতকরা পনের টাকা হারে বাট্টা দিয়াও, একশত টাকার নোট, অনেকে ভাঙ্গাইয়াছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। এইগুলি স্পষ্টতঃই অন্তর্ঘাত মূলক সমাজ বিরোধী অপরাধ এবং কঠিন হস্তে দমন করা ভিন্ন ইহা রোধ করিবার অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়না।

সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থা সমূহে, কর্ম্মচারীদের, কর্ম্ম শৈথিল্যের সাফাই হিসাবে এক শ্রেণীর পেশাদার ট্রেড্ ইউনিয়ন নেতারা বলিয়া থাকেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বেতন হারের অযৌক্তিক বৈষম্যের জন্যই সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালনে ঔদাসিন্যের প্রবণতা দেখা দিয়াছে।

বেতন হারের অসামঞ্জস্য যে অনেক ক্ষেত্রেই আছে তাহা আমরা অস্বীকার করিনা। এই অসমতাকে সংশোধন করিবার প্রয়োজন যে অবশ্যই আছে তাহাও অনস্বীকার্য্য। কিন্তু, প্রশ্ন এই যে, ব্যাঙ্ক ; এল, আই, সি, ডি, ভি, সি, প্রমুখ প্রতিষ্ঠান গুলির কর্মচারীদের কর্ত্তব্য অবহেলার কারণ কি থাকিতে পারে ? সম্প্রতি ট্রেড্ ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে, প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং, বিশেষ ভাবে এল, আই, সি এবং ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কর্ম শৈথিল্য ইত্যাদির বিরূপ সমালোচনা করিয়া, নিঃসন্দেহে, প্রমাণ করিয়াছেন যে, চক্ষু কর্ণ তাঁহার যথেষ্ট সজাগ আছে। সময় ও সুযোগের অভাবে এবং বিশেষ করিয়া, দেশের মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া পন্থী বিরোধী আন্দোলনের বিরামহীন সক্রিয়তার জন্যই সম্ভবতঃ, এই দিকে তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন নাই। বস্তুত, গত সাতাইশ বৎসরের মধ্যে এই সমস্যা গুলির প্রতি তেমন মনযোগ দেওয়া হয় নাই। স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করাইবার মত প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বিধি বিধান রচিত হয় নাই, চরিত্রের দিক দিয়া দেশাত্মবোধ বিরোধী চরিত্রই সৃষ্টি হইয়াছিল। অবিরত বিশেষ বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইয়া, ভোষণ মূলক জোড়াতালি দ্বারা কাজ চালাইয়া যাইবার ফলে সমস্যা ক্রমে জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। সাতাইশ বৎসর ধরিয়া যে আত্মঘাতি চরিত্র সৃষ্টি হইয়াছে চক্ষের নিমেষে তাহা সংশোধন হইবে এমন আশা যদিও করা যায়না তথাপি, আমরা এইটুকু আশা করিতে পারি যে, জরুরী শাসন ব্যবস্থার প্রতি সুবিচার করিবার জন্যই এই দিকে প্রধান মন্ত্রীর পূর্ণ মনযোগ আকৃষ্ট হইবে। ঠিক এই প্রসঙ্গেই, প্রধান মন্ত্রী, ট্রেড্ ইউনিয়ন নেতাদের যে উপদেশ দিয়াছেন এবং, তাঁহার শাসন বাণীকে, আপোশের সুরে নরম না করিয়া, যে দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, প্রধান মন্ত্রী, ইতি মধ্যেই ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলনের ভূমিকায় আমূল পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা তাঁহার এই প্রচেষ্টা সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করিতেছি এবং অত্যন্ত আগ্রহের সংগে এই উদ্যমের ফলাফল ও অগ্রগতি লক্ষ্য করিব। জরুরী শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী না হউক অথচ সফল হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

———

অগ্নিযুগের ইতি-গাঁথা

—মাখন গুপ্ত

—দ্বিতীয় ভাগ—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাসবিহারীর চলার গতিবিধি অনুসন্ধান করে পথে পথে ফাঁদ পাতা হল। চতুর ও অতি সতর্ক রাসবিহারী ভুল করেও সে পথে পা দিলো না। ধরার জন্য সর্বত্র মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হল। পুরস্কার ও পদোন্নতির আশায় পুলিশ গোয়েন্দা যখন দিল্লী, লাহোর ও কলকাতার অলিগলি, হন্তে হয়ে রাসবিহারীকে খুঁজে বেড়ায়,—বারানসীতে গড়ে ওঠে তখন তাঁর সর্বাপেক্ষা-বৃহৎ বৈপ্লবিক ঘাঁটি; সর্বক্ষণের সাথী ও সহকর্মী সেখানে শচীন সান্যাল। তাঁর আন্তরিক ডাকে সাড়া দিয়ে বাইরে থেকে এসে তাঁর সাথে যোগ দিয়েছে কর্তার সিং ও ভি, সি, পিঙ্গলে। চলার দুর্গম পথে সহযাত্রী হয়ে ছায়ার মত হল তারা তাঁর অনুগামী। দল বেঁধে এ সময়ে 'গদর' দলের বিপ্লবী শিখ সম্প্রদায় ভারতে এসে, বিধাহীন চিত্তে রাসবিহারীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে। উত্তর ভারতের প্রতিটি বিপ্লবী সংস্থা তাঁর নেতৃত্বে মুক্তি সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ সংহত ও একটি সূত্রে গ্রথিত হয়। নব উদ্যমে শুরু হয়ে যায় সেখানে ব্রিটিশ অধীনস্থ সৈন্য শিবির গুলিতে গোপন অনুপ্রবেশের কাজ। শিবির গুলির মোট সৈন্য সংখ্যা নিরূপিত হয় পিঙ্গলে, কর্তার সিং ও শচীন সান্যালের সহযোগিতায়। এরপর শুরু হয় ভিতরে জোর গোপন প্রচার। নির্ভিক এক দল সৈন্য স্বাধীনতা লাভের অদম্য উৎসাহে প্রচার কার্যে যোগ দেয়, ও ঠিক সময়ে রাসবিহারীর হুকুম তাদিদের প্রতিজ্ঞা পত্রে সাক্ষর করে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ। ইউরোপের রণকোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে পৃথিবীর আকাশ বাতাস। রণক্ষেত্রে মুখোমুখি অবতীর্ণ ইউরোপের দুই দেশ—এই বৃহৎ শক্তি ইংল্যাণ্ড এবং জার্মানী। ইতিহাসের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ভারত থেকে ইংরেজদের সমূলে উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেশ্যে জার্মানী থেকে অর্থ ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহের জন্য তথাকার ভারতীয় বিপ্লবীদের মুখপাত্র মহেন্দ্র প্রতাপের সাথে জার্মান সরকারের এক অস্ত্রচুক্তি সাক্ষরিত হয়। গোপন সূত্রে বাংলায় এ সংবাদ পৌছানোমাত্র বাংলার বিপ্লবী মহানায়ক যতীন মুখার্জী (বাঘাযতীন) এই চুক্তির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলনের' সহযোগিতায় যুদ্ধের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করেন। আর রাসবিহারীর নেতৃত্বে ভারতের উত্তরাঞ্চলের পূর্ব পশ্চিম সহ বিরাট অঞ্চলে, জনসংযোগ ও সংগঠনের জন্য বিশেষ স্থানগুলি নির্বাচনের পর, নিম্নলিখিত বিপ্লবীদের পরিচালনাধীনে আনা হয়। ধারাবাহিক ভাবের নাম—শচীন-সান্যাল, ভি, সি, পিঙ্গলে, কর্তার সিং লাহোর, প্রতাপ সিং, ভাই পরমানন্দ, পণ্ডিত পরমানন্দ, রায় শরণ দাস, দামোদর স্বরূপ, বিনায়ক রাও, গিরিজা বাবু, গিরিনাথ বাবু, বিভূতি বাবু, হুদেরাম।

রাসবিহারীর অভিনব প্রচার কৌশলে মুক্তির অদম্য উৎসাহ প্রেরণায় পয়ত্রিশটি সৈন্যশিবির নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ভারতে তখন মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ সৈন্যদের একসাথে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়। সাড়া দেয়

কিলাদ, রাতিবর্ন, রহাল সিঙি ও সোলোবের সৈন্যশিবিরগুলি। আগ্রহে দিন গোনে, কর্ণুল জলা, মীরাট, আগ্রা, মুলতান, এলাহাবাদ, বারানসী এ লক্ষ্ণৌ রেজিমেন্টের ব্রিটিশ কম্যাণ্ডারের অধীনস্থ ভারতীয় বিরাট সৈন্যবাহিনী। এদিকে কোহাট থেকে ডেরান, আর সোলোবার থেকে জব্বলপুর, এর ভিতরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ আয়োজন যখন সম্পূর্ণ সমাপ্ত,—পরিচালনার ভার যাহোর হল তখন সর্বাধিনায়ক রাসবিহারীর কেন্দ্রীয় হেড্ কোয়ার্টার। বোমা ও অন্যান্য গোলা নির্মাণের জন্য পাঞ্জাবের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত হল দু'টি কারখানা। দিনরাত কাজ করে সেখানে উৎপাদনের ব্যবস্থা। তারপর একপ্রান্ত বার্মা সিঙ্গাপুর, আর অপর প্রান্ত আফগানিস্থান থেকে এলো আক্রমণের পূর্বে অর্থ ও সৈন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। এরপর আক্রমণের নির্দিষ্ট দিন ধার্য হল ১৯১৫ খৃঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি যোগে। ভারতে অবশিষ্ট অত্যল্প সংখ্যক ইংরেজ সৈন্যদের হাতে হাতকড়ি পরানোর নির্দেশ। ঐ দিন ঐ শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় প্রতিটি শিবিরে তখন হাজার হাজার সৈনিক উৎসাহে আগ্রহে অপেক্ষমান। অল্প কয়েকটি দিন মাত্র বাকী, কল্পনায় ও স্বপ্নের অখণ্ড ভারত মুক্ত হবে, চল্লিশ কোটি সন্তানের চোখের সম্মুখে বাস্তব সত্যে মূর্ত হয়ে উঠবে।

কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে, যুগ যুগ পরাধীন ভারতে চিরকালের যে ধারা চলে এসেছে, জাতির চরম দুর্ভাগ্যের জন্য এবারেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটল না। কৃপাল সিং ও নবাব খান নামক বিশ্বাসঘাতক দুই গুপ্তচর স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে ব্রিটিশ হাই কম্যাণ্ডের এজলাসে এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ প্রকাশ করে দিল। ফাঁস করে এই পটভূমিকায় প্রধান নায়ক রাসবিহারীর দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর পরিকল্পনার আদ্যপান্ত ইতিহাস। সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে হাতকড়ি লাগাবার পালা। রাসবিহারীর কানে তৎক্ষণাৎ এ খবরের আভাসের ভার গিয়ে পৌঁছালো। অমনি তারিখ দুদিন এগিয়ে দিয়ে আর একবার ঘরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টার সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন রাসবিহারী। কিন্তু ঐ বিশ্বাসঘাতকদের তৎপরতায় আর তা সম্ভব হল না। নিরুপায় রাসবিহারী নির্দেশ দিলেন তখন শিবির ছেড়ে সমস্ত সৈন্যদের পালিয়ে যেতে। তাও তখন আর সম্ভব হলনা। স্থানে স্থানে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠলো। ফিরোজপুরে পঞ্চাশজন সম্মুখ সমরে একসাথে বিল জীবন আহুতি। আর গুলিবিদ্ধ আহত অবস্থায় এক'শ জনকে গ্রেফতার করা হল। কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট দিন ২১ শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহের আগুন সিঙ্গাপুরে প্রবলভাবে জ্বলে উঠলো। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে সিঙ্গাপুর পঞ্চত্রিশ নম্বর শিবিরের বিদ্রোহী শিখ ও মুসলিম সিপাহীদের সম্পূর্ণ অধীনস্থ রইল। বাইরে থেকে সৈন্য এনে, প্রবল আক্রমণে শেষপর্যন্ত সিঙ্গাপুর উদ্ধার করা হয়। সৈনিক আদালতের বিচারে বিদ্রোহী সৈন্যদের অনেকেরই হল প্রাণদণ্ড।

এ সময়ের মাইকেল ডায়ার সাহেবের এক বিবৃতির অনুবাদ—বিদ্রোহীদের সর্বপ্রধান ঘাটির চারটি বড় বড় ঘরে একসাথে হানা দেয় আমাদের অসমসাহসী গোরেন্দা প্রধান নিরাকৃত হায়াৎখান ও মিষ্টার এল. এল. টমলিন্। বন্দুক, বোমা ও বোমা তৈরীর সরঞ্জাম, নানাভাষায় লিখিত বৈপ্লবিক প্রচার পত্র ও তেরজা ভাতা সহ ১৩ জন দুর্ধর্ষ বিপ্লবীকে বিনা প্রতিরোধেই ওখানে তারা গ্রেফতার করে। দুর্ভাগ্য আমাদের রাসবিহারী ও শিখলেকে অনেক খুঁজেও ওখানে পাওয়া গেলনা।

শিখলেকে এর দুই সপ্তাহ পরে মীরাটে বহু বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র সহ গ্রেফতার করা হয়। নলিনী মুখার্জী গ্রেফতার হন জব্বলপুরে। পর পর নানা স্থান থেকে ২৪১ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে শুরু হয়ে গেল তাদের বিচার। দুফুরে বিয়াল্লিশজন বিদ্রোহীর হল প্রাণদণ্ড। একশ চোদ্দো জনের হল দ্বীপান্তর, তিরানব্বই জনের

সম্ভ্রম কাড়াদত। বিয়াল্লিশ জনকে বেকসুর মুক্তি দেওয়া হল। কিন্তু সারা ভারত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেলনা বাংলার দুর্ধর্ষ বিপ্লবী রাসবিহারীর কোন সন্ধান।

অভাবিত অতবড় বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে অনেক মহাবীরের অন্তর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ইস্পাতের চেয়েও কঠিন উপাদানে গড়া রাসবিহারীর মনোবল। ঐখান থেকেই নবোদ্যমে আবার তার পথ চলার শুরু। অন্ধকারের নিবিড় অন্তরালে পথের সহস্র বাধা অতিক্রম করে নিরাপদে অপ্রত্যাশিত ভাবে পৌঁছালো এসে একদিন বৈপ্লবিক পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে। তার বাল্য ও কৈশোরের চিরসখার উপবন চন্দননগরে। বন্ধুদের অনেকেই তাঁর অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত রইল। কোথাও ধরা না পড়ে পালিয়ে এসেছে শচীন সান্যাল ও গিরিজা-বাবুও। রাসবিহারীর সাথে তাঁদের দেখা হল চন্দননগরে। বাইরে সর্বত্র সর্বদা অনুসন্ধানরত গোয়েন্দাবাহিনী। সারা ভারতে পাতা জাল ক্রমে গুটিয়ে চন্দননগরের দিকে এগিয়ে আসছে। বেশীদিন এখানে থাকা অসম্ভব। ইংরেজের হাতে পড়ে ফাঁসি যাওয়ার পূর্বে এখনও একটি প্রশস্ত পথ খোলা আছে—ভারত থেকে বাইরে পালিয়ে যাওয়া, আর নিরাপদে সেখানে পা রেখে ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে, মহাযুদ্ধের সুযোগে বৈদেশিক অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য এগিয়ে দেওয়া। এই কথা চিন্তা করে পি, এন, টেগোর এই ছদ্মনামে জাহাজে জাপান পাড়ি দেওয়ার ছাড়পত্র সংগ্রহ করলেন রাসবিহারী। দিন ধার্য হল ১৯১৫ খৃঃ ১২ ই মে। বিডিরপুর ডকের ধারে নম্বর বোট থেকে জাপানগামী জাহাজ,—নাম 'সানুকী মারু'। সেদিনও যথাস্থানে যথা কালে তাকে পৌঁছে দিয়ে এলো শচীন সান্যাল ও গিরিজাবাবু। বিদায় সম্ভাষণের পরেও, আবার দুজনকে আলিঙ্গন করে বার বার বলে গেলেন—অতি সাবধানে থেকে কাজের ধারা সাধ্যমত অক্ষুন্ন রেখো। দুঃখ, বিপদ প্রতি মুহূর্তে আসবে, কিন্তু বিচলিত হয়োনা। ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই স্বাধীন হবে। কিন্তু আমি আর ফিরে আসবো কিনা জানিনা। এই নাও দুইজনে আমার ভালবাসার দুটি প্রীতি নিদর্শন।—এইবলে দুজনের হাতে তুলে দিলেন দুটি রিভলবার। বড়ের তাণ্ডব নৃত্যে ঊর্ধ্বের আকাশ পথে তখন ঘন ঘন বজ্র নিনাদ। কড় কড় শব্দে প্রকৃতির বুক চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে, নামল বৃষ্টি জলের অবিশ্রান্ত ধারা। শচীন সান্যালের চোখ দুটি কান্নার জলে ভরে উঠলো। রাসবিহারী তার চিবুক স্পর্শ করে বললেন,—বিচলিত হয়োনা। হাসিমুখে আর একবার শুধু বললেন,—'আসি তাহলে"। তারপর যে ধরে গন্তব্য পথে ধীরে ধীরে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ

—শ্রীক্ষীরোদ কুমার দত্ত

স্বামীজী বলেন, এশিয় সভ্যতার জন্ম নদীর তটদেশে, উর্বর জমিতে, গঙ্গা, ইয়াংসিকিয়াং ও ইউফ্রেটীস নদীর তীরে। এই সভ্যতার মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। এই সভ্যতা দেব ভিত্তিক। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার জন্ম পর্বতের বুকে অথবা সমুদ্রের তীরে। এই সভ্যতার মূল ভিত্তি লুণ্ঠন অর্থাৎ এই সভ্যতা আসুরী এবং দেববিরোধী।

স্বামীজী বলেছেন, ইউরোপীয় সভ্যতাকে একখণ্ড বস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সমুদ্রতীর এর তাঁত। এর সুতো বুভুক্ষিত নানা জাতির সংমিশ্রণ। এর টানা আত্মরক্ষার জন্য এবং নিম্ন বর্ণরক্ষার জন্য সংগ্রাম। এর পোড়েন ব্যবসা-বাণিজ্য। সভ্যতার সম্প্রসারণ হয়েছে অসিমুখে। সহায় সাহস ও শক্তি। লক্ষ্য —ভোগ ইহজগতে এবং পরলোকেও।

ইউরোপীয় সভ্যতার লক্ষ্য সকলকে ধ্বংস করে নিজে বাঁচবো। আর্য্য সভ্যতার লক্ষ্য—সকলকে টেনে উপরে তুলব, এমন কি নিজেদের চেয়েও উপরে তুলব। ইউরোপীয় সভ্যতা বিস্তার হয়েছে অসিমশক্তিকে আর আর্য্যসভ্যতা বিস্তার লাভ করেছে বর্ণবিভেদের মধ্য দিয়ে। এই বর্ণবিভেদ উচ্চসোপানে আরোহণের পাদপীঠ। সংস্কৃতি ও শিক্ষা উচ্চতর সোপানে আরোহনের সেতু। ইউরোপীয় সভ্যতা বিস্তারের ফলে ইউরোপ হয়েছে শক্তিশালী, সেখানে দুর্বলের হয়েছে মৃত্যু। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা, ভারতে প্রতিটি সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষার জন্য।

ইহাই ভারতের সামাজিক বিধি। ইহাই ভারতের জাতি। ভারতবাসী জাতির জন্য আমার জন্ম, জাতির জন্য আমি বাঁচবো। ইউরোপে ব্যক্তি বড়। ইউরোপ জন্ম থেকেই ব্যক্তিতান্ত্রিক, আর ভারত জন্ম থেকেই সমাজতান্ত্রিক। ভারত বলে—আমার বিয়ে সামাজিক ব্যাপার তাতে আমার কোন হাত নেই, আমার বলবার কিছু নেই। আর আমার বোনের বিয়েও একটা সামাজিক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছু নয়। এই জন্যই হিন্দুর বিয়ে হয় অল্পবয়সে—বিবেচনে যখন তার সম্মতির প্রয়োজন নেই। বিয়ের ভালোমন্দর সঙ্গে সে তখন জড়িত হয়ে পড়ে। তখন অল্পবয়সে বিয়ে হওয়াই ভাল। এর ফলে ভারতবাসী নর নারী অনেকখানি আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। নর নারীর প্রেমে পড়ার আবেগ ও অনুভূতি ভারতবাসীর এ বিবেচনে নেই। কিন্তু হিন্দু বলে, আমরা সমাজতান্ত্রিক। ব্যক্তি বিশেষের আনন্দ আমাদের লক্ষ্য নয়। একজন নর বা একজন নারীর আনন্দের জন্য আমরা সহস্র সহস্র লোককে দুঃখ সাগরে ডুবাতে চাইনা।

স্বামীজী বলতে চেয়েছেন, ভারতের সমাজতন্ত্র ভারতবাসীর গোলাম নয়, এ তার জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। স্বামীজী বলেন, সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে যাকে বলে সমাজতন্ত্র বা জনতার শাসন তা আমাদের।

মানুষ চাইছে সুযোগ সুবিধা, চাইছে কর্মকাজ, চাইছে উৎপীড়ন থেকে মুক্তি, চাইছে যুদ্ধ থেকে মুক্তি এবং চাইছে আরও খাদ্য।

আগামী যুগে সব লোক আবার যখন ব্রাহ্মণ হবে, সেদিন সম্পর্কে স্বামীজী বলেন, আদর্শ ব্রাহ্মণ সেই, যাঁরা সর্বপ্রকার স্বার্থপরতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, যাঁর সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম জ্ঞান ও প্রেমের সাধনায় নিযুক্ত। সকল ভারতবাসী সেদিন আবার ব্রাহ্মণ হবে। এই হবে ভারতের সমাজতন্ত্র। এই হবে ভারতের আদর্শ। সেদিনের সমাজতান্ত্রিক ভারতে কোন পুলিশের প্রয়োজন হবেনা, কোন সৈন্য বাহিনী থাকবেনা। তাই ভারতের এ সমাজতন্ত্র উচ্চ থেকে নীচুতে নয়, ভারতের সমাজতন্ত্র নীচু থেকে উঁচুতে। শূদ্র, বৈশ্য, এবং ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণত্বে পরিণতি ভারতীয় সমাজের মূল লক্ষ্য। স্বামীজীর কথায় অতীত ভারতে সবাই ছিল ব্রাহ্মণ, জাতি-ভেদ সে ভারতে ছিল, সেদিন ছিল সত্য যুগ : আসছে সত্য যুগে আবার সবাই ব্রাহ্মণ হবে। তখন হবে ভারতে সমাজতন্ত্রের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা। কার্লমার্ক্সও এই কথাই বলছেন—সমাজতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় কোন গবর্ণমেণ্ট থাকবেনা কোন শাসক থাকবেনা, শাসিতও থাকবে না, কারণ পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক জগতে কোন বিরোধ নেই। তবে স্বামীজীর সমাজতন্ত্রে এবং মার্ক্সএর সমাজতন্ত্রে তফাৎ এই যে মার্কস এর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি যেখানে সমাজের উচ্চশ্রেণীকে নীচে নামাচ্ছেন, স্বামীজী সেখানে নিম্নশ্রেণীকে উঁচুতে তুলছেন।

স্বামীজী বলেন, ভারতে জাতিভেদ পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থা। সামাজিক জীবনে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য সম্পাদন করবে। স্বামীজীর নিজের কথায়—আমি এক কর্তব্য করতে পারি, তুমি অন্য এক কর্তব্য করতে পারো। তুমি দেশ শাসন করতে পারো, আমি জুতা সেলাই করতে পারি। কিন্তু তা বলে তুমি আমার চেয়ে বড়ো হবে কেন? তুমি কি আমার মতো জুতা সেলাই করতে পারবে? তাই আমি যদি তোমার মত দেশ শাসন করতে না পারি তবে দোষ কি? আমি জুতা সেলাইএর কাজে নিপুণ, এবং আর একজন বেদ পঠন পাঠনে নিপুন। তা'বলে সে আমাকে পদদলিত করবে কেন? পায়ে ঠেলবে কেন? সমাজের একজন নরহত্যা করেও প্রশংসা পাবে, আর একজন আপেল চুরি করেও ফাঁসী যাবে এ ভেদ কেন? এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। জাতিভেদ অন্যায় নয়। জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের এই একমাত্র উপায়। মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হতে হবেই। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। বিশ্বে যেখানে যাবে সেখানেই জাতিভেদ দেখতে পাবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কারও কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা থাকবে না। কঠিন আঘাত করেই এ সুযোগ সুবিধাগুলি দূর করতে হবে। সমাজে কেউ কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। সবাই পাবে সমান সুযোগ। তাই এই সব সুযোগ সুবিধা এবং যে ব্যবস্থা এই সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করছে তা দূর করাই আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

———

দূরবীণে পশ্চিমবঙ্গ

—শান্তি শরণ রায়চৌধুরী

প্রবাসী মুখ্যমন্ত্রী ?

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী আবার ও দিল্লীযাত্রা করেছেন এবং কবে ফিরিবেন তা বল্‌তে চান্‌নি। উনি কি দিল্লীর অধিবাসী এবং পশ্চিমবাংলার প্রবাসী মুখ্যমন্ত্রী, এ প্রশ্ন মানুষের মনে স্বাভাবিক ভাবেই জেগেছে। বন্ধুবর সুবোধ মজুমদার হিসাব করে বলেছেন যে ১২০০ দিনের মধ্যে ৬০০ দিনই রাজ্যের বাইরে, প্রধানতঃ দিল্লীতে কাটিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্য থেকে এই হামেশা অনুপস্থিতি কি ক্ষতি করছে, সে সম্বন্ধে ও বক্তব্য রেখেছেন। সে যাহ'ক, এই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কেন বারবার দিল্লী যাতায়াত করেন, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে অতি সঙ্গত কারণেই। দুটী মুখ্য কারণ অনুমান করা যেতে পারে। সর্ব্বভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে এই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লীতে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন বোধ করেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কারণ অন্য কোন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীত নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্র ছেড়ে এত দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকেন না। দ্বিতীয় কারণ, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই প্রদেশের স্বার্থে এত ঘন ঘন দিল্লী যাতায়াত করতে পারেন। অবশ্য সেটা সত্যি হলে, ওঁর কর্ম্মদক্ষতার সুনাম বৃদ্ধি হবে না। একথা অবশ্য কেউ বল্‌বেনা যে দিল্লীতে উনি কখনও কোনও কারণেই যাবেন না। দিল্লীতে ওঁর উপস্থিতি যদি সর্বভারতের স্বার্থে খুবই প্রয়োজন হয়, তবে সকলের স্বার্থেই ওঁর এই প্রদেশের কর্ত্তব্যভার ত্যাগ করে, দিল্লীতে চলে যাওয়া উচিৎ। পশ্চিমবাংলার মত সমস্যাজর্জ্জরিত প্রদেশে সর্ব্ব সময়ের জন্য শ্রম, মনোযোগ, আন্তরিকতা, ও নিষ্ঠা নিয়ে যিনি কাজ করতে পারবেন না, তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকলে, পরিণামে এই প্রদেশের ক্ষতি হবে অপূরণীয়। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের হাতে কায়েকটী বিভাগ রয়েছে। তা ভিন্ন, সব বিভাগের মন্ত্রীরা তাঁর পরামর্শ ও নির্দ্দেশের অপেক্ষা করতে বাধ্য হন। প্রশাসনিক স্তরেও তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে কাজকর্মের গতি শ্লথ হতে বাধ্য। ফলে, অনেক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে, পরিকল্পনা রূপায়িত হ'তে বিলম্ব ঘটছে, বলুন না বলুন, অন্যান্য বিভাগীয় মন্ত্রীদেরও নিজেদের সাফল্যের স্বাক্ষর রাখা সম্ভব হচ্ছে না। মন্ত্রীরা একটী দল হিসাবেই কাজকর্ম করেন। তাদের দলপতিকেই যদি মাসের মধ্যে বেশী দিনই বাইরে থাকতে হয়, তবে ত খুবই মুস্কিলের কথা। জনসাধারণ ও এর ফলে, শাসক দলের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। তা ভিন্ন, এই মাত্রাধিক যাতায়াতের জন্য একটা গুরুতর দিকও আছে। মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লী যাতায়াতের খরচটা কত পড়ে ? অনুমান করলে ভুল হ'বে কি যে যোগফলটা খুব সামান্য হবেনা ? প্রকৃত পরিমাণটা জান্‌তে পারলে বলা হয়ত সম্ভব

হত যে এই বাড়তি খরচ বাঁচিয়ে কতটা হাসপাতাল উপকৃত হতে পারত, অথবা, কতগুলি দরিদ্র ছাত্রকে পড়াশুনার খরচ হিসাবে দেওয়া যেত, অথবা কতগুলি গ্রন্থাগারকে বই কিনবার জন্য সাহায্য করা সম্ভব হত, অথবা আরো ছোট ছোট অথচ অত্যাবশ্যকীয় কাজ করা সম্ভব হত। এ সম্বন্ধে গভীর ভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে এই দিল্লী অভিযান বন্ধ করে দেওয়া হবে কিনা এখনই।

বাগনান-এ (হাওড়া) মন্ত্রীদের বৈঠক—

সম্প্রতি বাগনানে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভার একটী বৈঠক বসেছিল। মন্ত্রীরা ঘুরে ফিরে উন্নয়ন-মূলক কাজকর্মের যে হাল দেখেছেন, তাতে নাকি তারা বিশেষভাবে হতাশ হয়েছেন। কর্মচারীদের অন্তহীন অজ্ঞতা, আশ্চর্যজনক ঔদাসীন্য ও মানসিক নিরাসক্তি তাদের বিস্ময়াভিভূত করেছে। প্রচুর টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে গৃহহীন, গরীবদের বাসস্থান নির্মাণের জন্য ও অন্যান্য জনকল্যাণ মূলক কাজ-কর্মের জন্য। কিন্তু প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে এমন লোক আছেন, যারা সরকারের নীতি ও কর্মসূচী কিছুই জানেন না এবং রূপায়িত করার কোন প্রচেষ্টা করেন না। কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতিসাধন, দুটিনটী ফসল উৎপাদন, সেচের উন্নতিসাধন প্রভৃতি কর্মসূচী বাস্তবায়িত করে, মানুষের অবস্থার উন্নতি করতে সরকার যে কতটা আগ্রহশীল, কয়েকটী অফিসার কে জিজ্ঞাসাবাদ করে, মন্ত্রীরা বুঝতে পেরেছেন, এসব লোকদের ছাঁটিয়ে না দিলে, সব ব্যর্থ হবে। অবশ্য টাকাটা খরচ হবেনা, এমন কোন নিশ্চয়তা মেলেনি। একজন বি. ডি. ওকে প্রশ্ন করা হল, কতটা জমি তার এক্তিয়ারের মধ্যে আবাদযোগ্য, উৎপাদনের হার কতটা। তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। অর্থাৎ পরীক্ষায় গোল্লা পেয়েছেন। সর্বাপেক্ষা দুঃখিত ও হতাশাপীড়িত হয়েছেন নাকি কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদাস সাত্তার। পূর্তমন্ত্রী শ্রীহোলাবাথ সেনের অভিজ্ঞতাও কিছু কমতি নয়। উলুবেড়িয়া এক নম্বর ব্লকে প্রায় ৪ একর জমির উন্নতিসাধন করে গৃহহীন ৬০০ শত মানুষকে সাহায্য করার জন্য ৮৬,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তার একপয়সাও খরচা হয়নি। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, এবং এস. ডি. ওকে কেন একাজ হয়নি প্রশ্ন করা হলে, এক একজনে এক একরকম জবাব দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তারা এ বিষয়ের কোন গুরুত্ব দেননি, এমনকি, জিনজনে বসে একত্রে সলা পরামর্শও করেন নি। নদী থেকে জল তুলে সেচের কাজে ব্যবহার করার জন্য যে দরিয়ন্তার একজনের ইঞ্জিনিয়ারের উপর ন্যস্ত ছিল, একাজ কেন হয়নি মুখ্যমন্ত্রী জানতে চাইলে তিনি জবাব দেন যন্ত্রপাতি অকেজো এবং আগামী নভেম্বর মাসে সেটা মেরামত হবে। অর্থাৎ চাষবাসের ঝুটঝামেলা মিটে গেলে ধীরে সুস্থে একাজ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী আশাহত হয়ে নাকি বলেছেন যে এদের কোন জরুরী প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন বোধ নেই এবং দেশপ্রেম বলে কোন বস্তুও এদের মধ্যে নেই।" খাঁটি সত্য কথা সন্দেহ নেই। বাগনানের ঘটনাকে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই জন্যে যে এই অপকর্মে বাগনানের অফিসাররা একক নয়। সারা পশ্চিমবাংলায় এদের দোসর সংখ্যা প্রচুর। কাজেই অবহিত হবার পক্ষে একদিনও সময় নষ্ট করা উচিৎ হবেনা।

কিন্তু প্রশ্ন কয়েকটা থেকেই যাচ্ছে। এরা এইভাবে কোন ভরসায় সরকারী আদেশ অমান্য করে, মানুষের দুঃখ দুর্দশার প্রতি উদাসীন থাকতে সাহস পেল? বিভাগীয় মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ অফিসাররা এই অমার্জনীয় ত্রুটী এতদিন আবিষ্কার করতে পারেনি কেন? ধরা যখন পড়েছে, তখন কাজ না করার সময়ের জন্য এদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে কেন? কি ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে নিতে যাচ্ছেন মন্ত্রীরা? এত দেশদ্রোহীতার সামিল। দেশের অভ্যন্তরে যারা দেশের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করতে চাইছিলেন, তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্যই ত প্রধানমন্ত্রী দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন। তবে এরা সেই আইনের কবল থেকে রেহাই পাবে কেন? দেশের মানুষের দুর্দশা লাঘব করার জন্য প্রধানমন্ত্রী যে ব্যবস্থা নিতে চান, এইভাবে চললে ত সবই ব্যর্থ হবে। তার কৈফিয়ৎটা কি মানুষ তা জানবার দাবী করলে অন্যায় হবে কি? দরিদ্র দেশের মানুষ রক্ত জলকরা টাকা দিয়ে ট্যাক্স দেবে, অথচ প্রতিদানে কোনও সাহায্য পাবেনা। এটা কোন্ ব্যবস্থা? মন্ত্রীদেরও অবশ্যই মাটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। দেশ বিদেশে ভ্রমণ করে বেড়ালে চলবে কি? বাগনান্ এলাকা থেকে এম. এল. এর বক্তব্য কি? ঐ উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি তিনি নজর রাখেন নি কেন? তিনি কি এই চরম অব্যবস্থার কথা মন্ত্রীদের গোচরে এনেছিলেন? এনে থাকলে, কেন তার প্রতিকার হয়নি? না এনে থাকলে কেন তিনি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবেন না? বাগ্‌নান এলাকার ঘটনা একটী বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে আমরা মনে করিনা। খোঁজ করলে, বহু বাগ্‌নান বেরিয়ে পড়বে। দেশের ক্ষতিকর কাজ করে এই জরুরী অবস্থায় কারো রেহাই পাওয়া উচিৎ নয় বলে আমরা মনে করি। দেশের স্বার্থে এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ দেখলে মানুষ খুশী হবে নিশ্চয়ই। এই নীতি অনুসৃত হোক, এটাই জনগণের কাম্য।

বিধান চন্দ্র স্মরণে—

—জীবানন্দ ভট্টাচার্য

তের বৎসর পূর্বে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় চলে গিয়েছেন। কাল বশে মানুষের স্মৃতি ম্লান হয়ে আসে কিন্তু বিধান চন্দ্রের স্মৃতি অম্লানই নয় যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে, কেন না যে সমস্ত কাজ তিনি সুরু করেছিলেন তা ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করছে। যেমন যেমন এগুলি পূর্ণতার দিকে যাবে তেমন তেমন, তাঁর ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, বিধান চন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীতে অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের ৬ মাসের মধ্যেই। কি ছিল অবস্থা! খণ্ডিত বাংলা—অবচ্ছেদের ফলে পশ্চিম বঙ্গের ছিন্নমস্তা রূপ-উত্তর অংশের সাথে দক্ষিণের কোন যোগ নেই। রাজ্যের অর্থ ভাণ্ডার শূন্য, তদুপরি লক্ষ লক্ষ ছিন্ন মূল মানুষ আসছে দেশের বিচ্ছিন্ন অংশ থেকে। উদ্বাস্তুই নয় পশ্চিমবঙ্গেরও কয়েক সহস্র লোক ভেসে বেড়াচ্ছে তার পাঁচ বছর পূর্বের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় থেকে, ১৯৪৬ এর দাঙ্গার রক্তের দাগ তখনও মুছে যায় নি। এই দুয়ে মিলে কয়েক সহস্র লোক ও অনাথ বালক বালিকা সরকারী সাহায্যে বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে। ১৯৪২ এর বিপ্লব, ৪৩ এর মন্বন্তর '৪৬ এর দাঙ্গা—সর্বোপরি '৪৭ এ মায়ের রক্ত ঝরা অঙ্গচ্ছেদ। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। লোকে তাকে বলত, 'নিদানের বিধান', কিন্তু কত বিকৃত পশ্চিমবঙ্গ তাকে পেল যেন 'বিধির বিধান'। বিধি নিষ্ঠুর না হলে তিনি তো উত্তর প্রদেশের গবর্ণর পদ পেয়ে ছিলেন, কেন্দ্রের কোন গুরু দায়িত্ব নেবার আহ্বানও ছিল।

প্রাত্যহের চাপ তো ছিলই—কিছু সমস্যার আশু সমাধান চাইই—কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য কিছু পরিকল্পন না করলে অদূর ভবিষ্যতেই অন্ধকার। কেন্দ্রীয় বড় বড় প্রকল্পের কিছু পশ্চিমবঙ্গে আনতে হবে,—কলকাতা শহরের প্রসার চাই,—কিছু শহরও গড়ে তুলতে হবে, পুনর্বাসিত করতে হবে রোগে মহামারিতে উজাড় গ্রামগুলো।

যেন ইঞ্জিনের কারখানাটি মিহিজামে হবার কথা ছিল। বিধান চন্দ্রের চেষ্টায় তা হল পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জনে। নামকরণ করলেন চিত্তরঞ্জন লোকোমটিভ—শহর 'চিত্তরঞ্জন' শুরু দক্ষিণা ছিলেন বিধান চন্দ্র। ঐ '৪৮ সালেই কল্যাণী শহরের পরিকল্পনা সুরু। কলিকাতার প্রসার চাই গঙ্গার ঘোলা জল নিয়ে লবন হ্রদের বিস্তৃত এলাকা ভর্তি করা আরম্ভ হল। বিধান চন্দ্রের দৃঢ়তার ফলেই সম্ভব হয়েছিল আন্দামানে বাঙালীর বসতি স্থাপন, সেও ঐ '৪৮ এর ডিসেম্বরই সম্ভাবনা বাচাই। এরপর তৃতীয় ইস্পাত কারখানার স্থান নির্বাচনের কথাবার্তা চলছে। দুর্গাপুরের জন্য দাবি তুললেন বিধান চন্দ্র। স্থির হল দুর্গাপুর—আর ঐ উপলক্ষে সমগ্র করিমপুর থানারই অধিক্রমের নোটিশ পড়ল, উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় ইস্পাত কারখানার পাশেই বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের নিয়ন্ত্রণে না না শিল্প স্থাপন। ইস্পাত কারখানার জন্য যখন বুনিয়াদ চলছে তখনই পশ্চিমবঙ্গের অংশে কোকওভেন নির্মাণ সুরু হয়েছে। চালু হলেই যাতে কলকাতায় গ্যাস আসতে পারে তার জন্য প্রায় ১২০ মাইল পাইপ বসানর কাজ আরম্ভ হল। আর ছোটখাট কারখানা, হাসপাতালও অনেক বাড়ির রান্নার কাজেও এই গ্যাস। এত সবের মধ্যেও দৃষ্টি এড়ায় নি দীঘার সমুদ্র সৈকত। সেখানে গড়ে উঠছে বিশ্রাম আগার, পর্যটন কেন্দ্র। পরবর্তী কাজ হলদিয়ার বন্দর নির্মান। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞরা আসছেন, স্থান নির্বাচনের জন্য যে যে জায়গা দেখান হবে তার মধ্যে হলদিয়ার নাম নেই যেন না হলদিয়ার সম্ভাব্যতার সমর্থনে কোন তথ্য কেন্দ্রের হাতে নেই। টেলিফোনে গর্জন করলেন—প্রোগ্রামে হলদিয়ার নাম রাখ তথ্য দুদিনে তিনি যাচ্ছে। তথ্য সম্বলিত চিঠির খসড়া দেখার ভার যার উপর পড়ল তিনি তখন 'ইণ্ডাস্ট্রী' বিভাগের সেক্রেটারি অশোক মিত্র। বেরিয়ে এসে মৃদু হেসে বললেন দেখুনতো বলাই ইণ্ডাস্ট্রীর সেক্রেটারি, এখন ম্যাপ নিয়ে কানুনগো সার্ভেয়ারের শরণ নিতে হবে। অন্নজায়ী

নিরসন করা এই ভদ্রলোক তখনও অকাট্য যুক্তি দিয়ে চিঠি তৈরি করে দিলেন। ফলশ্রুতি আমরা দেখতেই পাচ্ছি, আগামী বছর থেকেই বৃহৎ জাহাজ ভিড়বার উপযোগী অন্যতম বৃহৎ বন্দর হলদিয়া, তৈল শোধনাগারও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠছে ঐ বন্দর নগরীতে।

বিধানের বিদ্যার নিদর্শন। স্ব-ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন এক অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর। যে কাজেই হাত দিয়েছেন ঐ প্রতিভাই প্রতিফলিত হয়েছে। আজকের যারা যুবক তারা তাঁর কাজ কর্ম দেখছেন যা তাঁকে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী রূপে কিন্তু তৎপূর্বে বহু কৃতিত্বের তিনি অধিকারী। নানা কাজের সাফল্যের তিলক পরে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেছিলেন। দু'একটির উল্লেখ করা যেতে পারে। "চিত্তরঞ্জন সেবাসদন"—কী সম্বল নিয়ে আর কি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। যাদবপুর যক্ষা হাসপাতাল। প্রভাস নামে এক যুবকের অকাল মৃত্যু হয় যক্ষারোগে। তিনি সামান্য যা কিছু ছিল দিয়ে যান বিধানচন্দ্রের হাতে এই অনুরোধ রেখে যেন কোন হাসপাতালে যক্ষার পৃথক কক্ষ (Insolation ward) বা নিতান্ত পক্ষে দুটি শয্যার ব্যবস্থা হয়। কুমুদশঙ্কর রায় তখন যক্ষা বিশেষজ্ঞ হবার জন্য বিলাতে। বিধানচন্দ্রের কল্পনা অনেক দূর নিয়ে গিয়েছে তাকে। কুমুদবাবু ফিরতে বললেন—শয্যা টয্যা নয়, হাসপাতাল গড়ে তুলতে হবে। গড়ে উঠল যাদবপুর যক্ষা হাসপাতাল। তাঁর মৃত্যুর পর ডাঃ রায়ই নামকরণ করলেন "কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষা হাসপাতাল"। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল আজ যা 'কলেজ' ওটাও বিধান চন্দ্রের হাতে গড়া। তার নির্দেশিকেন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস। বিধানচন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী হবার পূর্বে ঐ স্কুলের পাশ করা ডাক্তাররা সরকারী স্বীকৃতি পেতেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন তিনি দুবার, কিন্তু তিরিশ বৎসর কাল তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত অধিক অনটনের মধ্যেও তাঁর আশুতোষের স্মৃতিসৌধ ঐ যে 'আশুতোষ বিল্ডিং' ওটা সম্ভব হয়েছিল তাঁরই কর্ম কুশলতায় এবং ঐকান্তিকতায়।

বিরাট কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভিতরের মানুষটি সহসা চোখে পড়তনা। 'মানুষ' বিধানচন্দ্রের সংবেদনশীল মনের পরিচয় মেলে ছোট ছোট ঘটনায়। অসংখ্য ঘটনার ভিতর একটির উল্লেখ করলে কথাটা স্পষ্ট হবে' মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মহাকরণের ঘটনা। তখন অফিস ছুটি হয়ে গেছে, চিফ্ সেক্রেটারি সত্যেন রায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে যেতে দেখলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনে ময়লা জামাকাপড় পরা একটি লোক বেঞ্চের হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে আছে। এখানে কি? জিজ্ঞাসা করতে লোকটি যা বলল তার অর্থ এই যে তার ছেলের যক্ষা হয়েছে, হাসপাতাল থেকে যে ওষুধ দিতে বলেছে তা সরকার অনুমতিছাড়া মিলেনা—(ষ্টেপ্টোমাইসিনে তখন ঐ ব্যবস্থাই ছিল), স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাকে আসতে বলেছিলেন। কথা বলতে বলতে তিনি ডাঃ রায়ের ঘরে ঢুকলেন। দরজা ঠেলে ঢুকছেন তখন ঐ লোকটি ডাঃ রায়ের চোখে পড়ে। ওকে? তখন রায়সাহেব ঘটনাটি বললেন। 'ডাক ওকে'। সে আসতেই সব শুনলেন ডাঃ রায়, ছেলের নামও হাসপাতালের বেড্ নম্বর নিলেন। তাকে বললেন পর দিন সকালে তার বাড়িতে যেতে। ডাঃ রায়ের পি. এ, যখন তাকে বুঝিয়ে বলছেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন—স্যার, কাল সকালেই না পরশু বলব? না না কালই—দেখছনা ওর মনের অবস্থা। রাত সাতটার পর মহাকরণ থেকে নামলেন ডাঃ রায়। ড্রাইভারকে বললেন—লেক্ হাসপাতালে চল। লেকে তখনকার মিলিটারি হাসপাতাল তখনও ছিল অতি সাধারণ লোকের স্থান মিলত বিশিষ্ট লোক কেউ সেখানে ছিলেন না। অথচ অতরাত্রে সেখানে ডাঃ বিধান রায়। রোগী দেখলেন রোগীকে নির্দেশ দিলেন, উপস্থিত ডাক্তারকে নির্দেশ দিয়ে বাড়ি ফিরলেন—রাত তখন ন'টা। পরদিন ভোর থেকেই লোকটি এসে বসেছিল। দেখতে পেয়েই বললেন তোমার ছেলের যক্ষা হয়নি—ও ওষুধ ছাড়াই সেরে যাবে, চার পাঁচ দিন পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে।

সঞ্চয়ন

—শ্রীনিরপেক্ষ।

[একদল মতলববাজ মানুষ দেশব্যাপী একটা হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করতে চাইছেন কোথাও কিছুই হয়নি বলে। এই নেতিবাচক মানসিকতা উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে ক্ষতি কর। আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করব, সরকারী ও বেসরকারী স্তরে দেশের কোথায় অগ্রগতি কতটা কি হয়েছে এবং হচ্ছে, তার একটা সঠিক চিত্র দেশবাসীর নিকট তুলে ধরতে। অনেক কিছুই করতে হবে, এটা যেমন সত্য, আবার অনেক কিছুই করা হয়েছে, যার জন্য গৌরব অনুভব করা চলে, সেটাও সমান সত্য। নেতিবাদ ও নৈরাশ্যবাদের প্রবক্তাদের বক্তব্যের মধ্যে বরং সত্যের অপলাপ আছে প্রচুর পরিমাণে—সম্পাদক।]

ভিলাই ষ্টীল কারখানায় ১৯৭৫ সালের প্রথম তিন মাসে ৩,৮০,০০০ টন ইস্পাত প্রস্তুত করেছে। গত বছরের ঐ সময়ের উৎপাদনের তুলনায় এটা ২৫,০০০ টন বেশী। শতকরা ৭% বেশী উৎপাদন হয়েছে এবং এটা সম্ভবপর করেছে, বিল মেরামতি করার প্রচুর খরচা বাদে এবং ৭ দিন এজন্য বন্ধ থাকা সত্ত্বেও।

ঐ একই সময় ধাতুপিণ্ড তৈরী হয়েছে ৪, ৫৮,০০০ (চার লক্ষ আটান্ন হাজার টন), তুলনায় ৬৫,০০০ হাজার টন বেশী। উৎপাদন বৃদ্ধির হার শতকরা ১৭%। লৌহদণ্ড (Pig Iron) তৈরী হয়েছে দেড় লাখ টন। বৃদ্ধির হার শতকরা ২১%।

* *

রাউরকেলা, দুর্গাপুর এবং বার্নপুর থেকে লৌহপিণ্ড তৈরী এবং বিদেশে বিক্রীর কাজ হয়েছে সন্তোষজনক। দশহাজার টন বিক্রয় যোগ্য ইস্পাত বিদেশে পাঠান হয়েছে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। পরিকল্পনা এমন ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় চতুর্থাংশে ৪০,০০০ হাজার টন পাঠান সম্ভব হবে।

* *

দুর্গাপুর ষ্টীল প্লান্ট সার্বিক কৃতিত্ব অর্জন করেছে। বর্তমান বৎসরের দ্বিতীয় তিনমাসে (এপ্রিল-জুন) এখানকার উৎপাদন বেড়েছে ১,১২, ৫০১ থেকে ২,০৪, ১৬৬ টন (লৌহ দণ্ড , ১২৯,৮৭৯ থেকে ২,৩৫,০০০ টন (তপ্ত ধাতু)

* *

কাঞ্চুরাদায় ও তার বীজ বিদেশে বিক্রী করে বছরের প্রথম চারমাসে ৫৯·২১ কোটী টাকা আয় হয়েছে। গতবছর এই সময়ে এই হার ছিল ১১·৩০ কোটী টাকা।

এই সময়ে Raw nuts এর আমদানী ৪৯,২৩৯ (মূল্য ১০ কোটী ৩২ লক্ষ টাকা) টন থেকে কমিয়ে মাত্র ২০·২৯৮ টন-এ দাঁড় করান সম্ভব হয়েছে। এর মূল্য ৪ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা।

* *

Aid Indian Consortium এর প্যারিস বৈঠকে ঠিক হয়েছে যে ভারতকে ১৭০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেওয়া হবে। ঐ প্রতিষ্ঠান সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন এবার। ভারতের অর্থ-নৈতিক কাঠামোর উপর এদের বিশ্বাস রাখবার কারণগুলির মধ্যে প্রধান হল মুদ্রাস্ফীতির হারটি যখন সারাবিশ্বে প্রবল, ভারত তখন এর সার্থক মোকাবিলা করেছে। শতকরা ৩০ ভাগ থেকে মুদ্রাস্ফীতির হার ভারতে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে মাত্র শতকরা ৪ ভাগ। এটা ঐ সংস্থা খুব প্রশংসনযোগ্য মনে করেন। যদিও এই সংস্থা মনে করে যে উন্নতির মান খুব উঁচু হতে পারে নি, কিন্তু দেশ তারা সারা বিশ্বের কতগুলি ঘটনাকে আয়ত্ত করতে পারে নি বলেই মনে করেন। বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি, শিল্পের কাঁচামাল, রপ্তানীতি প্রভৃতির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিকে দায়ী করেছেন। সাহায্য প্রদানকারী দেশগুলিও স্বীকার করেছেন, তাদের মত উন্নত দেশে মুদ্রাস্ফীতি যখন মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, ভারতের অর্থ-নৈতিক ক্ষতটা তখন খুব আশাপ্রদ। বিশেষ ভারতের মুদ্রাস্ফীতি রোধের প্রচেষ্টা খুব সফল।

(ক্রমশঃ)

Freedom Fighters whose Pension has been sanctioned

LIST—81 (from 9162—9234)

Dist—CALCUTTA

NAME	ADDRESS	(Amount per month in Rs.)
Adhikari Jnanendra Nath	16/1, Haralal M. St.-3	200
Banerjee Smt. Baruna	P-23, Babu B. Le. 31	150
,, Bholanath	15/1, Ekdalia P. 19	200
Bhattacharjee Amar nath	675, Jessore Rd. 55	200
,, Bhupendra nath	58, Asokegar, 35	200
Biswas Amulya Kr.	62/8, Maniktola M. Rd. 54	200
Bose Bibhuti Rjn.	54/10, K. D. Rd. 36	200
,, Kshitish Ch.	6-A, B. P. Rd. 26	200
,, Smt. Latika, C/o. Smt Panna rani.	39/B, Beniapukur Le. 14	200
Chakraborty Janaki Kr.	713, M. S. B. Rd. 49	170
,, Jyotish Shekhar	2-5, Asokenagar Cy. 40	200
,, Smt. Mrinalini, w/o L. Sachindra Kr.	174/C, R. B. A. 29	100
,, Narendra kr.	5/215, Jatindas N. 56	200
Chatterjee Gopal Ch.	58/H, B. C, Sr. 9	200
,, Smt Indulekha	10/1, Gopal M. Rd. 34	200
,, Nripendra nath	40/1, Tangar Rd. 15	200
,, Pratap kr.	17, Jubili park, 33	200
Choudhury Smt Aruna, w/o Jatindra N.	44/M, Kalighat Rd. 26	100
Das Dhirendra Ch.	1/2/4, Talpukur Rd. 11	200
Das Sisir Rjn.	35, A. M. Rd. 25	200
Datta Smt Arati, w/o L. Bijoy B. Dutta	3/1, R. B. Le. 12	150
Dey Bimalendu	Palit St. 19	200
,, Hari Narayan	97, Kalighat Rd. 26	180
,, Mrs. Shelly	1/19, Regent Cy.	200
Ganguli Binode Behari	16/A, Raja M. Rd. 37	200
,, Ramendra Nath	9/A, Kabir Rd. 26	200
Ghosh Balai Lal	16, Haralal M. St. 3	200
Ghosh Manindra Mohan	37, Belgachia Rd. 37	200
,, Malay Kr.	3/E, Palm Avenue 19	200
,, Rabindra nath	S. N. P. St. 25	200
,, Smt Sita	15/A, Bhim G. Le. 6	200
Ghosal Kalidas	L-44, Netaji Cy. 50	200
Goswami Niranjan Prasad	5/87, Jatindas Nagar 50	200
Guha Santi Gopal	165, Dakoliapar Rd. 28	200

Kundu Santosh Ch.	2/32, Vivekna[illegible] 32	200
Majumdar Amulya	2/1, G. B. Le. 54	200
Mitra Dhirendra Kr.	30A. Nandan Le. 25	200
Mukherjee Sachindra nath	1811, Bagbazar St. 3	200
Nag Anil Ch.	1/296. Nakrala 47	200
Pal Ganesh Ch	83/1, D. H. Rd. 23	200
Roy Amarendrajit	14A, Dr. S. B. Rd. 29	200
Roy Jagadish Ch.	5, Badan Roy Le. 10	200
Roy Smt Nani Bala, w/o Hemanta Kr.	200, Subashnagar By Le. 28	100
Roy Prafulla,	40E Palm Avenue, Cal-19	200
Roy Rajendra Lal	9 Bindu Palit Le. 6	200
Sarkar Dulal, alias Hrishikhab Sarkar	8B Pitambar Sarkar Le, 23	200
Sarkar Smt. Sushalata w/o Palit Paban	17-7, Raja R. K. St 6	50
Sasmal Profulla Kr.	453, Rabindra S. 5	200
Sengupta Smt Saraju, w/o L. Gopika Bilas,	98, Karava Rd. 19	100
Sikdar Krishna Pada,	Milan Pally 56	200
Sil Hari Charan,	Nandan nagar Co. 582 56.	200
Tarafdar Smt. Protiva Rani w o Nirmal Ch.	107 Santoshpur 32	300

Dist—H O W R A H

Baitalik Smt. Radha rani, w/o L. Amarendra nath.	D. Durgapur	100
Sri Banerjee Biswanath	Bikihakola	200
Smt Broja bala Banerjee, w/o L. Amarendr nath.	Khantora	200
Sri Banerjee Sankar Lal	Nalpur	200
,, Bera Ranjan Kumar	Sajungachi	200
,, Bera Satish Chandra	D. Bauria	200
,, Bose Krishnapada	Muralibar	200
,, Chkraborty Bacharam	Andul	200
,, Chakraborty Bhadreswar	Bikihakola	200
,, ,, Silendra nath	S. Duillya	200
,, Chatterjee Arun Kr.	35, Ram M. M. Le.	200
,, ,, Kshemesh Rjn.	Gujarapur	200
Smt ,, Nihar Bala, w/o L. Bankim Chandra.	70, B. B. Le.	100
Sri ,, Nirmalendu	50/4 Ananda Kr. R. C. Le.	200
,, Das Samatul Chandra	5/A, Ramkinu S. Le.	200
,, Debi Sarala, w/o L. Bhabanada Banerjee.	3/1, G. M. 2 bye Le.	100
,, Dey Narendra nath	Duilya.	200
,, Ghosh Arun Kr.	11/3, P. S. C. K. Le.-1	200
,, ,, Gour Mohan	Madoni	200
Smt ,, Helena	Andul-3	160

(To be continued.)

Regd. No. R. N.24511/71 Biplabi Bangla Regd. No. C/391

MENDED-2008

C144

1975

সম্পাদক মণ্ডলী : সর্বশ্রী অমরীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), পরিমল বসুমজুমদার, শান্তি শরণ রায়চৌধুরী
প্রকাশক ও মুদ্রক:—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০০৯ হইতে
মুদ্রিত এবং বিপ্লবী বাংলা কার্য্যালয় ৪নং বন্ধুচরণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭, (ফোন : ৩৪-১১৯৪) হইতে প্রকাশিত
সম্পাদক—বিনয় সেনগুপ্ত